OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 475 -481
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 475 - 481
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কথাসাহিত্যে দলিতদের উপস্থিতি : বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

রূপালী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : rupalibarman122@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Dalit, Sabaltern, Untouchable, Suffering, Marginal, Nature, Social deprivation, Neglect.

Abstract
Literature talks about the world and life. Literature is open and appropriate for all, from all walks of life. But the Dalit literature we are talking about is those who are economically deprived, socially oppressed, neglected, humiliated and deprived for ages; The subject of our discussion is to highlight how the presence of life pain in the hearts of those marginalized, exploited, deprived, neglected people who are untouchable by the so-called caste-based society, who are Dalit by birth due to social discriminations, has came up in Bengali literature. While discussing the context of the position of Dalits in Bengali fiction, it has been shown how Dalits have appeared in modern Bengali fiction from ancient and medieval literature. An attempt is made to discuss the extent to which the history of the sufferings of Dalits born and brought up in a hostile environment has emerged in the works of other writers. Because the life that has not realized the pain of their deprived life, that life can never reveal the true nature of that pain. The true form of literary work depends on the mind, mentality, thought, religious and social beliefs of the writer.

Discussion

বিশ্বের প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই কোন না কোন সময় কোন না কোন একটি সমাজ বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নব দিগন্তের পথে অগ্রসর হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন কোনো দেশের কোনো সাহিত্য রচনা সম্ভব নয় তেমনি সমাজের তথাকথিত নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত ও দলিত শ্রেণীকেও বাদ দেওয়া চলে না। কারণ সমাজে উচ্চবর্গীয়দের একচেটিয়া উচ্চ অবস্থানের ফলে নিম্নবর্গীয়রা ক্রমাগত বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছে এবং নিমজ্জিত থেকে গেছে সেই অন্ধকারেই। সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কবি সাহিত্যিকদের মানসজাত হলেও সমাজকে বাদ দিয়ে বা সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে সেই শিল্প সৌন্দর্য বিকশিত হতে পারে না। সাহিত্য, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, কিংবা রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক চাঞ্চল্যকে কেন্দ্র করে কালে কালে বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই কবি সাহিত্যিকেরা

সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও যেকোনো ধরনের ক্রিয়াকলাপ তাঁর জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙালি সমাজ মূলত উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুটি ধারায় বিভক্ত। উচ্চবর্গের মধ্যে রয়েছে সমাজের উপরতলার লোকেরা; যেমন সামন্তপ্রভু, মহাজন, ভূস্বামী, ধনিক, বণিক প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। আর নিম্নবর্গের মধ্যে রয়েছে কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, অনুন্নত শ্রেণী, পতিত, লালিত, দলিত, আচারভ্রষ্ট সম্প্রদায়সমূহ। এই নিম্নবর্গের মানুষেরা; সমাজের প্রায় দূরবর্তী যাদের অবস্থান তাঁরা নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পটভূমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে, ইদানীং যাদের 'দলিত' বলা হচ্ছে; আগে তাদের 'চণ্ডাল' আখ্যা দেওয়া হত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের অবহেলা, দীর্ঘ বঞ্চনার কাহিনি নিজেদের ভাষায় লিখতে এগিয়ে এসেছেন; ফিরে পেতে চেয়েছেন নিজেদের প্রাপ্য সম্মান, সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নিজেদের জন্য সাহিত্য। এই নিম্নবর্গ বা আদিবাসী বা দলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের কথাই আমাদের আলোচ্য। কিন্তু এই দলিত কারা? দলিত কাদের বলা হয়েছে? তথাকথিত সমাজে থেকেও কেন তাঁরা বঞ্চিত? এইসব প্রশ্নের সমাধানের জন্য দলিতদের নিয়ে প্রচুর লিখতে হবে, তাদেরকে জানতে হবে, তাঁদের বুঝতে হলে আমাদের তাদের সহমর্মী হয়ে উঠতে হবে।

এই দলিতদের নিয়ে বর্তমানে নানা মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। অনেকে মনে করেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে 'দলিত' একপ্রকার বিশেষ তকমা, সাহিত্য নিয়ে এক ধরনের পুতুলখেলা; তাদের হেয়দৃষ্টিতে, নিম্নবিত্ত ছোট জাতের মানুষ জঞ্জাল; তাঁরা কখনও সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না। দলিতরা মনে করেন; বৈষ্ণব সমাজকে নিয়ে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য, শিশুদের নিয়ে শিশু-কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি নিয়ে ভ্রমণসাহিত্য, কৃষ্ণকথা নিয়ে পৃথক সাহিত্য রচিত হতে পারে তবে দলিত বা নিম্নবিত্তদের নিয়ে কেন সাহিত্য রচিত হতে পারে না।

ভারতবর্ষে দলিত বা তথাকথিত নিম্নবর্গ (সাবলটার্ন) মানুষদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিশ শতকের আশির দশক থেকে। বিদ্যাচর্চার প্রকরণ হিসেবে এই সময়পর্বকে দলিত সাহিত্যের সূচনাকাল ধরা হলেও এর সূচনা হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। মহারাষ্ট্রে প্রথম 'দলিত সাহিত্য' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে বি. আর. আম্বেদকরের মূল ক্ষেত্রভূমিতে জ্যোতিরাও ফুলে ও আম্বেদকরের হাত ধরে। লিটল ম্যাগাজিন ও দলিত সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দলিতদের নিয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত সাহিত্য শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছেন; যেমন, আন্নাভাঁও শাঠে, শঙ্কর রাও খারাট, বাবুরাও বাগুল এবং পরবর্তীকালে সাবিত্রীবাই ফুলে, গুরুচাঁদ ঠাকুর, তারাচন্দ্র খান্ডেলকর, যোগীরাজ ওয়াঘমারে, অবিনাশ দোলাশ, যোগেন্দ্র মেশরাম এবং ভীমরাও শিরভালে প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ এই সাহিত্য আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্ধনে এগিয়ে এসেছেন।

> "বাবুরাও বাগুলের ছোটগল্পের সংকলন 'জীভা মি জাত চোরলি হোতি' (যখন আমি জাত লুকিয়েছিলাম) মারাঠি সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিল।"[১]

'সাবলটার্ন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' বা 'দলিত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রণজিৎ গুহ।[২] এই দলিত তথা শুদ্র শিক্ষাচর্চার অগ্রণী পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, দেবেশ রায়, জ্ঞান পান্ডে, অর্জুন ডাঙ্গলে, ডেভিড আর্নল্ড, ডেভিড হার্ডিম্যান, স্টিফেন হেনিংহ্যাম প্রমুখ এবং এদের সাহিত্য চর্চাকে বলা হয় সাবলটার্ন বা নিম্নবর্ণের ইতিহাস।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার পথযাত্রা শুরু হয় উপনিবেশিক ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমালোচনার হাত ধরেই। নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রবক্তারা মনে করেন উপনিবেশিক ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস উচ্চবর্গের দৃষ্টি থেকে লেখা, এই ইতিহাসে উচ্চবর্গীয়দেরকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যমণি করে দেখানো হয়েছে; সেখানে নিম্নবর্গীয়দের স্থান গৌণ। নিম্নবর্গীয় প্রবক্তারা মনে করেন পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন ভারতবর্ষে পরিণত করতে কোটি কোটি কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, দলিত আদিবাসী সকলেরই বিনিদ্র চিন্তা-চেতনার প্রভাব ছিল। এই বিনিদ্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 475 -481
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বাধীন চেতনাবোধ থেকে কৃষক, শ্রমজীবী, আদিবাসী নিম্নবর্গরা শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন, দলনের ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। তার ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মান্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে পেয়েছি।

সামাজিক ক্ষমতার ভেদাভেদে সাবলটার্ন অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী অবিরত শোষিত ও শাসিত হয়। 'ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি ('সাবলটার্ন' শব্দের সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক প্রয়োগকর্তা) 'সাবলটার্ন' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে'।[৩] নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রবক্তারা সেই ঐতিহ্যগত ধারাকে ভিত্তিহীন মনে করে তাঁরা ভিন্নমত প্রদান করেন। তাঁদের মতে, ইতালির মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশির শোষণ ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের চেতনায় যে আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে সেই চেতনাকে জাগাতে কৃষকের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করতে তাঁরা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছেন ভারতবর্ষের ভূমিতে তাঁদের সংস্কৃতিকে খুঁজতে, নতুন করে সাহিত্য লিখতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লিখতে এবং লিখেছেনও।

শুরুর দিকে দলিত সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে কোনও সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ব, লক্ষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। উচ্চবিত্তের ভাষা ব্যবহারের শুদ্ধতা অর্থাৎ তথাগত মার্জিতবোধকে দৃঢ়তার সঙ্গে লঙ্ঘন করেছিল এই দলিত সাহিত্য। এই সাহিত্যে কাল্পনিক গল্পগাথার চেয়ে বাস্তবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও আত্মস্মৃতি প্রকৃত জোরের জায়গা। তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণাকে অগ্রাহ্য করে তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠীসমূহের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎসানুসন্ধান করে বৈষম্যহীন সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলাই এই সাহিত্যের দৃঢ় প্রত্যয়। এই সাহিত্য লেখকেরা সম্পূর্ণ নতুন চিন্তায়, নতুন আঙ্গিকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া তথাকথিত নিচুতলার মানুষদের জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে নতুন পটভূমি গড়ে তুলেছে। তবে বাংলা ভাষাতেও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা জুড়ে বেশ কয়েক দশক থেকে দলিত সাহিত্যচর্চা নব বাস্তবতার উদ্বোধনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিহাসের ভিত্তিতে ১৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দের সময়কালে আর্যরা ভারতে আসার পর চামড়ার রঙের বিচারে আর্যজাতি থেকে উচ্চবর্ণ এবং শুদ্র ও দলিতসহ নিম্নবর্ণের লোকেরা অ-বর্ণের থেকে এসেছে বলে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল। তবে চৈতন্যদেব সেই বৈপরীত্য ভেঙ্গে দিয়ে হিন্দু সমাজে উঁচু নীচু ভেদাভেদ না করে বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথায় কুঠারাঘাত করে বলেছেন 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে মোর ঠাকুর'। বৈদিক সাহিত্য মানেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ, তাদের আরাধনা এবং গুণকীর্তন করা। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধের গুণগান ও তাঁর কীর্তির প্রকাশ, পরবর্তীতে বৈষ্ণব সাহিত্যেও দেখা যায় রাধা-কৃষ্ণের লীলাময় কাহিনি বর্ণনা। সুতরাং বৈদিক কাল থেকে ঋগ্বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে জাতি ও বর্ণপ্রথার অমানবিকতা, অবিচার, অসাম্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে বেদান্ত সংস্কৃতির ধারা। এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে নিম্নবর্গদের দলিত, অস্পৃশ্য, নিচুজাত প্রভৃতি মর্যাদাহীনভাবে দেখানো হয়েছে। মনুসংহিতায় মনু হিন্দুধর্মের যে দন্ডবিধি দিয়েছিল এবং একাদশ শতকে শঙ্করাচার্য এসে যে বিধান চালু করলেন তাতে নিচু জাতের লেখা, পড়া, এমনকি শোনা সবকিছুই একপ্রকার বন্ধ করে দেওয়া হল। এর ফলে তৎকালীন শুদ্র তথা বর্তমানে দলিত মানুষদের বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তখন তাদের সাহিত্য রচনা তো দূরের কথা; পড়া লেখা শেখাই কল্পনার অতীত ছিল।

দীর্ঘকাল এভাবে চলতে চলতে তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও সকল ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে গেল, চিন্তা, বিচার করতে ভুলে গেল, প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেল। একবিংশ শতকেও সেই ঘোর রয়ে গেছে অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ সেই সময়ে কবি কল্পনার ব্যাপ্তিতে কখনও কোথাও কোন দলিত বা অস্পৃশ্য চরিত্রকে স্রষ্টা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি; যার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হিন্দুধর্মের আধিপত্যে একদল মানুষ এক ঘরে হয়ে রইল। তবে বাঙালি সত্তা পরিপূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়নি। সুতরাং গ্রাম বাংলার নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ আশ্রয় নিয়েছে বৌদ্ধ, সহজিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতি, আউল, বাউলসহ লোকসংস্কৃতির নানান অঙ্গনে এবং সামাজিক ও আর্থিক শ্রেণীবিন্যাসে অবহেলা, অমর্যাদা, শোষণ ও নিপীড়নের গাথা নিজের কথনে ও বয়ানে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সামাজিক, ধর্মীয় সংকটের তীব্র দ্বন্দ্বের ফলে তামিল অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা ভাগবত পুরাণ রচনা করলেন। ভাগবত পুরাণের 'ভক্তিরত্নাবলী'তে বলা হল ভক্তিবাদী চণ্ডাল ব্রাহ্মণের চেয়েও বড়; দেবদেবী তথা ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ্যতার কোনও স্থান দেওয়া হয়নি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 475 -481
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে চৈতন্যদেবের আগে যে লেখালেখি হয়নি এমন নয় দলিত বা নিম্নবর্গের লোকেদের নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই কমবেশি লেখালেখি হয়েছে এখনও হচ্ছে। প্রাচীন সাহিত্যের দিকে তাকালে চর্যাপদকে নিম্নবর্গের উৎকৃষ্টতম কাব্য বলা চলে। চর্যাপদে সেকালের ছোটো বড়ো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আচরণের কথা সহজ সরল সুন্দর ও স্বচ্ছ ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে ঐশ্বর্য ও বিলাস ব্যসনে আসক্ত ভোগকামী, ঔদ্ধত্য রাজার কথা উঠে আসেনি; উঠে এসেছে ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক ইত্যাদি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ও জীবিকা, কর্ম ও আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পূজার্চনা, ক্রিয়াকর্ম এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়।[৪] ডোম, শবর, নিষাদ, পুলিন্দ ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা অস্পৃশ্যতার জন্য গ্রামের বাইরে উঁচু জায়গায় কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন। এদের বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, বাঙালি বোনা, নৌকা বাওয়া; তথাকথিত ব্রাহ্মণরা এদের স্পর্শ করতেন না এই চিত্র আমরা দেখতে পাই চর্যার ১০ নং পদে –

> "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছই ছোই জাই সো ব্রাহ্মন বড়িআ।।"[৫]

সৌন্দর্যের অধিকারিনী ডোম্বির রূপের তীব্র আকর্ষণে সঙ্গলাভের কামনায় কামান্ধ ব্রাহ্মণ নাড়িয়ারা তাদের কুঁড়ে ঘরের আশেপাশে সময় অসময়ে কামতাড়িত হয়ে ঘুরে কিন্তু সেই রমনীকে আয়ত্ত করতে পারে না। এই ডোম্বিরা বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরে বসবাস করলেও নাচগান করেই জীবীকা নির্বাহ করতেন। সেই প্রমাণ ও রয়েছে চর্যায় – 'এক হয় পদ্ম তার চৌষট্টি পাপড়ি। / তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী বাছনি।' এরা নাচেগানে পারদর্শিনী ছিলেন বলেই অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীদের থেকে তাঁদের সামাজিক বাঁধানিষেধ অনেকটা শিথিল ছিল। যে সমস্ত সহজযানী ও কাপালিকরা জাতি ও সংস্কার মানতেন না তাদের বিবিধ ধর্মাচরণে ডোম্বিদের সঙ্গিনী হতে কোনো বাধা ছিল না। তাইতো এই চর্যার রচয়িতা কাহ্ণুপাদ লিখেছেন ডোম্বির জন্য নটের পেটিকা ত্যাগ করেছেন, হাড়ের মালা গলায় ধারণ করে যোগী কাপালিক হয়েছেন।

ধর্মনির্ভর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণত মঙ্গলকাব্যকেই বুঝে থাকি। কেননা মধ্যযুগের অনেকটা সময় জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিধারা। সেই সময়কার রাজনৈতিক পালাবদল, সামাজিক পরিস্থিতি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা; বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যের বৃহৎ ইতিহাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের কথা। দৈবী মহিমায় এখানে নিম্নবর্গের মানুষ ও নিম্নবর্গের দেবতা উভয়েরই উত্তরণ ঘটেছে নিজ নিজ সমাজে। মনসামঙ্গলে নিম্নবর্গের দেবতা মনসা শিবের মানসকন্যা, অলৌকিক শক্তিসম্পন্না হলেও তাঁর পূজা দিতে গিয়ে শিবভক্ত উচ্চবর্গের মানুষ চাঁদ সওদাগরের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সমস্ত সংগ্রাম আসলে উচ্চবর্গের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গের দেবতাকুলের।

আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুর আজও নিম্নবর্গের মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে চলেছে। গৌরীর বাগদিনীরূপ দেখে কুচনি আসক্ত শিবের কামমোহিত হওয়ার বিষয়টিতে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে করিডোর সৃষ্টি করে ফেলে। মনসামঙ্গলে দেবতা মানুষের লড়াই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় সমাজের চিরকাল ধরে চলে আসা শ্রেণী বৈষম্যকে। আসলে উচ্চবর্গের মানুষের জাতরক্ষার খাতিরে সেদিন নিম্নবর্গের মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এখানে আর্য ও অনার্য সাংস্কৃতিক সম্মিলনের ফলে দেবতাদের কথা নিয়ে বিদ্যোৎসাহী সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মানুষের প্রয়োজন অনুভব করে কাহিনি নির্মিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের দেবতার অলৌকিক দেবতা হয়ে ওঠা কিংবা নিম্নবর্গের দেবতার কৃপা লাভ করে নিম্নবর্গের সমাজে উত্তরণ উভয়েরই মূলে রয়েছে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সম্মলিত রূপ।

পরবর্তীকালে বাহ্যিক বা আত্মিক যে কোনও তাড়নায় তাড়িত হয়ে সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে কিছুকাল পরে পর্যন্ত কোন দলিত বা নিচু জাতের সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া যায়নি। নিজেদের স্বার্থেই উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ভেদাভেদ তৈরি হয় আবার নিজেদের স্বার্থেই বর্গ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কারণ সেই সময়েও এই নিচু অবস্থান স্থিত মানুষের সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, হয়নি মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন। তাই দলিত তথা শূদ্রদের শিক্ষার দিকে কারও নজর ছিল না। কিন্তু সে কি শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেই আছে? স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস-গল্পে কি তা নেই? হয়তো আছে আর থাকবেও। আর সেজন্যই মঙ্গলকাব্য থেকে আধুনিক যুগ ধরে সাহিত্যের আলোচনা করা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, যতই প্রগতিশীল

হোক না কেন, জাতপাতের বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও নিম্নবর্গের শিক্ষা বা শুদ্র শিক্ষা নিয়ে তাদের ভাববার প্রয়োজন মনে হয়নি। তাদের রচনায় দলিত জীবন নেই বললেই চলে। তাইতো রবীন্দ্রনাথও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন তার লেখনি 'হয় নাই সর্বত্রগামী'।

নিম্নবর্গদের মধ্যে যখন লেখা পড়ার শিক্ষা শুরু হল তখন অনেকের মস্তিষ্কের কুন্ডলিকৃত সুপ্ত প্রকোষ্ঠগুলি একে একে খুলতে লাগল। শুরু হল দোষ-গুণের বিচার এবং দেখা গেল হিসাব রক্ষক হিসেবে পুরো সমাজটাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অবহেলিত ইতিহাসের ডোরে বেঁধে রেখেছে। ক্ষোভে, দুঃখে পঞ্চ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে এবং সামাজিক অন্যায়, বঞ্চনা, শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হল প্রতিবাদ। তাদের সামাজিক মুক্তির তথা প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম হল সাহিত্য বা লেখনি। কারণ বর্ণভেদ, উৎপীড়ন, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুনে দগ্ধ হওয়ার ইচ্ছাশক্তি যতই থাকুক না কেন নিজে সেই আগুনে দগ্ধ না হলে যেমন অগ্নিপরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, সীতাকেও অগ্নিকুন্ডের আগুনে দগ্ধ হতে হয়েছিল, তেমনি সমাজের উপরতলার লেখকেরা নিচুতলার মানুষদের নিয়ে লেখা লেখকদের অগ্নিপরীক্ষার খবর কিভাবে পাবেন!

যাদের নিয়ে কোনদিনও কোন শোষক শ্রেণীর কলম লিখেনি; সেই লেখা একমাত্র শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিই লিখতে পারবে। নিজের কলমে, নিজের কথায়, নিজের ভাষায়, নিজের অনুভূতি একমাত্র নিজেরাই প্রকাশ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে একটি কলম একটি তরবারির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রথমত ব্যাকরণগত ভুল ত্রুটি যাই হোক না কেন নিরন্তর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একদিন তাদের লেখা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে উত্তরণ ঘটবে। তাদের নিজের কলমে, নিজের কথায় মনের ভাব প্রকাশ এবং আগুনে দগ্ধ জীবনের কথাই দলিত সাহিত্যের রূপে গৃহীত হয়েছে। ১৯২৮ সালে লেখা অন্নদাশঙ্কর রায় একটি সমীক্ষায় বলেছেন –

> "আমরা কুলিমজুরকে নিয়ে দু'দশ পাতার নভেল লিখতে পারি কিন্তু তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পালকি বইতে পারি না, তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। ভালোবাসতে পারি কিন্তু মন জানতে পারি না, মন কল্পনা করে কাগজ ভরিয়ে লিখে চলি। এই আমাদের ডেমোক্রেটিক সাহিত্য। একশো বছর পরে পানওয়ালি ও পালকি বেহারার দল যখন সাহিত্য সৃষ্টি করবে তখন আমাদের রচিত তাদের মনস্তত্ত্বকে জাদুঘরে রেখে আমাদের মনস্তত্ত্ব গবেষণা করবে।"[৬]

বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীতে বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র অথবা প্রেমচন্দ্রের মতো লেখকদের আবির্ভাব হলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় রাজকীয় আভিজাত্যের মহিমায় উদ্ভাসিত সত্য ও সুন্দরের অভিন্নতা, গ্রাম জীবন অপেক্ষা মধ্যবিত্তের আত্মদ্বন্দ্ব ও সংকটের চিত্র উঠে এসেছে, তাঁর অনেক রচনায় গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র উঠে গেলেও তা আপাতভাবে সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুঁথিগত শিক্ষা, মননশীলতা, ধর্মতত্ত্বসমৃদ্ধ, দেশাত্মবোধক সামাজিক ইতিহাস উঠে এসেছে। শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ্রের রচনায় ভারতের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ বিশেষ করে পতিতা ও বিধবা নারীদের নানা সমস্যা নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন বাস্তবতা উঠে এসেছে। ভালোবাসার কাঙাল চালচুলোহীন গার্হস্থ্য জীবন সন্ধানী শরৎচন্দ্রের লেখা সাহিত্য বাঁধভাঙ্গা নদীর মতো বাঙালি সমাজের অতি সাধারণ হৃদয়ের মরা গাঙে বান ডেকে এনেছে। প্রথম মাটি থেকে উঠে আসা একজন লেখক শরৎচন্দ্র নিজেই লিখেছিলেন –

> "মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না'- সামাজিক অভিযানের সেই চোখের জলের সাহিত্য সৃষ্টি ছিল তার অভীষ্ট।"[৭]

শরৎচন্দ্র উত্তর যুগের ত্রিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যে স্থায়ী লেখক হিসেবে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে এলেন। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে গ্রাম জীবন ও শহর জীবনের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ পেলেও বিভূতিভূষণ গ্রাম্য প্রকৃতি নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যেভাবে গ্রাম চেতনা, নিঃসর্গ প্রেম ফুটে ওঠে তারাশঙ্করের রচনাতে শুধু গ্রাম্য ও শহরের মানুষ নয়; রয়েছে ভারতীয় জীবনের সমগ্রতা অর্থাৎ রাজনৈতিক

চেতনার বিস্তার, গোষ্ঠী জীবন ও গণজাগরণের ছবি। বিভূতিভূষণ ত্রিশের দশকেই ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস থেকে শুরু করে ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’ লিখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে অরণ্য প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে ভরপুর সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের কোমলতা ও রোমান্টিক স্বপ্নময়তায় এই লেখক হয়ে উঠেছে অনন্য। বাঙালির মনে পথের পাঁচালীর কিশোর নায়ক অপু হয়ে উঠেছে কৈশোরের প্রতীক। বাঙালি পিতা মাতার মনের অঙ্গনে অপু দুর্গার প্রতীকী নাম বাঙালি সমাজ সংসারে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ দান।

তারাশঙ্করের রচনায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের চিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, বাউরি, কাহার, বাউল, বৈরাগী, বেদে, বোম, ঝুমুর ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের নৃত্যগীতময় সুখ-দুঃখের প্রাণচঞ্চল উদ্দীপনার ইতিহাস উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চৈতালি ঘূর্ণি’ থেকে শুরু করে ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী’, ‘কবি’, ‘গণদেবতা’ প্রভৃতি সৃজনকর্ম বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনায় কামার অনিরুদ্ধ, নাপিত তারাচরণ, ছুতোর গিরিশ চাষীর সন্তান ও নিজ হাতে চাষবাস না করে মহাজনী কারবারে ধনবান ছিরু প্রমুখ গ্রাম্য চরিত্রদের উপর মজলিস শাসন ও কর্তৃত্বের ছবি স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বিশ শতকের গোড়া থেকে ভারতীয় কথা সাহিত্যের রূপরীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। গ্রাম ও শহর জীবনকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন লেখকের রচনায় একটা নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে। এই সময় পর্বের রচনায় দেখা যায় - গ্রামের শোষিত, পীড়িত নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থার রূপায়ণ, আঞ্চলিকতাধর্মী উপন্যাস রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি, সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ উৎঘাটনের প্রবণতা, শ্রমিক ও কৃষক জনগণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বা চিত্র, লোকায়ত জীবনধারার স্বরূপ সন্ধান ও তার সাহিত্যিক রূপায়ণ ঘটেছে।

দলিত লেখকদের মধ্যে নলিনী বেরা পশ্চিমবঙ্গের শবর, সাঁওতাল ভূমিজ, কুম্ভকার ইত্যাদি সমাজের ধর্ম, আচার, সংস্কার সম্পর্কে অনেক লেখালেখি করেছেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনিতে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে নিম্নবর্গ সমাজের জীবন জিজ্ঞাসার চিত্র। সমরেশ বসুর বেশিরভাগ লেখায় সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম তথা নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত প্রভাব তুলে ধরেছেন। কারণ জঙ্গলাঞ্চল একদিনে জঙ্গল সাঁওতাল হয়ে ওঠেনি। এর পিছনে রয়েছে বড় কঠিন এক ইতিহাস। সাঁওতালদের অসাধারণ সাহস, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, সীমাহীন আনুগত্য, অকল্পনীয় পরিশ্রম ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম মানবিক দরদ জঙ্গলের সম্পদগুলোকে আগলে রেখেছে।

অভিজিৎ সেনের রচনায় উচ্চবর্ণদের খড়্গ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণের যাযাবর বাজিকর জাতির বেদনাদায়ক অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নবর্গের জাতিগুলো উচ্চবর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে আভাসিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের সম্পর্কের সংঘাত উচ্চবর্ণের দ্বারা। অরণ্যের গর্ভে নিরাপদ আশ্রয়ী ব্রাহ্মণবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও অনুশাসনে গোষ্ঠী জীবন সংহত থাকে না। দলিত শ্রেণীর ‘একজন’ হয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে তিনি নিম্নবর্গ বা আদিবাসী বা দলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত সচেতন বিদ্রোহের কাহিনিকে ‘দলিলীকরণ’ করেছেন। উচ্চবর্ণের বর্ণ আভিজাত্য এবং নিম্ন বর্ণের বর্ণাশ্রমের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অসম্মানের প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন মহাশ্বেতা। কিছু বিপন্নগোষ্ঠী ও ষোড়শ শতকের পটভূমি থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরঙ্গ পরিসরে নিবিড়ভাবে এঁকেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী এই ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা’ বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেছেন- অ্যাটলিস্ট আলোচনা হচ্ছে, অ্যাটলিস্ট স্টাডি হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, অনেক না জানা জিনিস বেরিয়ে এসেছে। সে সব দিক থেকে তার গুরুত্ব আছে বৈকি। আমি চিরকালই তাদের (নিম্নবর্গের) নিয়ে লিখেছি। (অমৃতলোক ১০৩, ২০০৫, পৃ. ৮৮) অনিল ঘড়াইয়ের লেখায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকস্মিক আঘাতে পরাজিত হতদরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের বিপন্ন পরিস্থিতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত ধরা পড়েছে। মঞ্জু বালার লেখনিতে রয়েছে দলিত চেতনা ও সমাজ দর্শন, লিলি হালদারের রচনায় বাঙালি দলিতদের আত্মপরিচয়ের খোঁজে নিরন্তর অগ্রগতির প্রচেষ্টা, উঠে এসেছে দেবব্রত বিশ্বাস তথা জর্জ বিশ্বাসের লেখা ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীতে ম্লেচ্ছ থেকে জর্জদা হয়ে ওঠার কাহিনি, উত্তরের দলিত লেখক গর্জন কুমার মল্লিক বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ধীমাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য রক্ষায় নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চলেছেন গর্জন মল্লিক।

বর্তমানে সাহিত্য জগতে আরও অনেক নিবেদিত প্রাণ দলিত সাহিত্যিক তাদের নিরলস সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে দলিত সাহিত্যের প্রসার ও অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছেন। সৃষ্টি ও সময়ের গতিপথ কোন ক্ষমতাই রুদ্ধ করতে পারে না। তবে দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে, দলিতদের বঞ্চনার ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য ও দলিত সমাজের বর্তমান অবস্থা জানতে হয়। তবেই তাদের প্রকৃত সত্য জনসমাজে তুলে ধরা সম্ভব হবে। তাঁদের নিয়ে লিখতে হবে প্রচুর লেখনি বা সাহিত্য। সেই লেখনির তীব্র নিনাদে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হুংকার জাগিয়ে সমাজকে সচেতন করতে হবে, ঘুমন্ত সমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং সাহিত্যের মান উন্নত করতে নতুন লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হবে তাতে করে প্রকৃত পাঠকের বুকে শেল বিঁধতে পারে। আর সেই পাঠককূল যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে একসময় নিজেরাও দলিত সাহিত্যের শরিক হতে উঠতে পারে। বর্তমানে অনেক দলিত লেখক চলমান সাহিত্যের ফুল বিছানো পেলবতায় আটকে না থেকে নিজ নিজ লেখনিতে স্থান দখল করে নিয়েছে।

ভারতের বেশিরভাগ মানুষই দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। একটা সময় প্রাপ্ত সুযোগ ও বঞ্চনার অভাবে তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। আজ যদি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তারা সেই পথ অনুসরণ করে তবে এই সাহিত্য অচিরেই বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে জায়গা করে নিতে পারবে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িত বিহারীলালই শুধু ভোরের পাখি নয়, দলিত সাহিত্য সৃষ্টির কীর্তি কবি সাহিত্যিকরাও ভোরের পাখি।

Reference:

১. রায়, দেবেশ সংকলন ও সম্পাদনা, দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৪৫
২. মন্ডল, সেলিম বক্স, বস্তুবাদী সাহিত্যপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১০, পৃ. ৮৩-৮৪
৩. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায় পার্থ সম্পাদিত, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩
৪. মজুমদার, অতীন্দ্র, চর্যাপদ, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ৮ম মুদ্রণ ১৪০৬, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫
৫. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, চর্যাগীতির ভূমিকা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০০৫, পৃ. ২০৮
৬. ঘোষ, সত্যপ্রিয়, মানিক সাহিত্যের যুক্তি তর্ক গল্প, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৮
৭. তদেব, পৃ. ১৩